International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-IX, October 2016, Page No. 1-11
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনার রূপরেখার ইতিহাস: একটি বিশ্লেষণ

অরুন মাহাতো
গ্রন্থাগারিক, নন্দলাল ঘোষ বি. টি. কলেজ, পানপুর, নারায়ণপুর, উত্তর24 পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

This Essay presents the "History of an Outlining the thought about book and library: An Analysis". Book, as we see to-day is not the only vehicles or medium of the transmission of human knowledge thought the age science the drawn of human civilization and culture book is rather younger generation in comparison to its ancestors –Clay tablets ,papyrus Scrolls parchment and paper manuscripts and such as other objects. It is a long fascinating history of the human culture. On the other hand people have made pictorial orwritten records of their ideas, their relations with others and the world around them and they had to need preserve. So simultaneously people have organized collections of records are transformation temples place to public libraries .This paper mainly focused on the how to develop the concept of a book sense or a materials and also how to develop the with establish the concrete and concept of the library for human culture in our society.

Key Words: Concept of book, Conceptof library, Earliest book and Library, Pictorial of book and Library. Mordern concept of book and Library.

ভূমিকা: গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গের ইতিহাস বহু প্রাচীন ও বহু বিস্তারিত ইতিহাস আছে, তবে এখানে খুবই সংক্ষিপ্তাকারে প্রাথমিক ধারণার পাওয়ার চেষ্টা করেছি, যাহা যাহা উপরোক্ত শিরোনামের বিষয় বস্তু হিসাবে যতদূর আমার সম্ভব ও সাধ্যের মধ্যে অনুধাবনের সঙ্গে নিম্নে বর্ণিত করার চেষ্টা করেছি সৃষ্টির শুরুতে মানুষ ছিল অত্যন্ত আশায়, বিভিন্ন প্রকৃতির ভয়াল প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়তার ভিত্তি থেকেই মানুষ ক্রমান্বয়ে সমাজ গঠন করে আর এই সমাজের প্রাণ মানুষ, আর মানুষের প্রাণকেন্দ্র ও বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন (খাদ্য , বস্ত্র , বাসস্থান ছাড়াও) তা হল শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফসল হল গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। যাহা লেখক, কবি, গবেষক, সম্পাদক, ছাত্র, শিক্ষক বিভিন্ন মাধ্যমে লেখার বিভিন্ন রূপরেখার দ্বারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের কল্যাণ কামনার সাধন করেন। এখানে যেহেতু গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, এই দিক বিবেচনা করে 'গ্রন্থবিদ্যা' সম্পর্কে কিছু অংশ বর্ণনা কর হলো। ইংরেজি 'Bibliography'- কথাটির পরিভাষা 'গ্রন্থবিদ্যা' এটি প্রায় বেশ কয়েক বছর আগে চালু হর, তবে বর্তমানে বেশ প্রচলিত হয়ে গেছে। আদি কথাটির অর্থ হলো 'গ্রন্থ লেখা' কিছু পরে এই অর্থ বদলে দাঁড়াল 'গ্রন্থ নকল করা' অর্থাৎ লিপি করে কাজ কর্মে তার পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায় 'গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখা' বা গ্রন্থের বিবরণ 'গ্রন্থবিদ্যা' বিষয়টি ব্যাপক, তার কারণ গ্রন্থ যে উপাদানে গঠিত হয় তাদের ইতিকথা যথেষ্ট ব্যাপক। গ্রন্থের সকল উপাদান সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়েই গ্রন্থবিদ্যা যাহা মূলত প্রাথমিক ভাবে গ্রন্থ থেকেই সৃষ্টি। গ্রন্থের উপাদান কি কি

একখানা বই দেখলেই তা জানা যায় গ্রন্থের উপাদান হল- কাগজ, মুদ্রণ, চিত্রণ, গ্রন্থন ও অন্তঃস্ত বিষয়বস্তু।

রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে মানব সভ্যতার ও সংস্কৃতি সেই মহানার তীর ছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর যে মধ্যে প্রাচ্যের ট্রাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদী দুইটির মধ্যবর্তী শস্য-শ্যামল প্রান্তরে। মানব সভ্যতার সেই ঊষাকালে আবিষ্কৃত হয়েছিল সভ্যতার এক বিস্ময়কর সামগ্রী-লেখনী অথবা খোদাই করার যন্ত্র, যা থেকে বলা যায় যে, সব কিছু স্মৃতিতে রাখা যায় না; রাখলে ও তাঁর প্রমান থাকে না। তাই প্রয়োজন ছিল দলিল রাখার আর্থিক, ব্যাণিজ্যিক, সামাজিক, স্থাবর সম্পত্তির, এমন কি শেষ বাসনার। এইভাবেই লেখার প্রথম আধার ছিল পোড়ামাটির ফলক। যে মানুষের বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্টি। পরবর্তীকালে বাহ্যিক সুবিধার জন্য লেখেন সামগ্রী হিসাবে মধ্য প্রাচ্যের পোড়া মাটির ফলক ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায় তার স্থান অধিকারে মিশরের প্যাপিরাস তার সহজাত গুণের জন্য এবং লেখার জন্য ব্যবহার কলম হিসাবে ব্যবহৃত হত নলখাগড়ার মতো দ্রব্য ও কালি দ্বারা লেখা হত পেপিরাস (payros) নামের এক বস্তুর উপর। এই নলখাগড়ার মত গাছ জন্মাত নীলনদের ধারে। এই পেপিরাস শব্দ থেকেই পেপার শব্দটির উৎপত্তি। কালের প্রবাহ ধারায় প্যাপিরাসের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে সীমিত হয়ে যায়। কারণ প্যাপিরাসের গাছ কেবল মাত্র মিশরের নীলনদের আব্বাহিকাতেই জন্মাত। পরবর্তীকালে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় .অন্য দিকে মধ্য প্রাচ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ প্রচুর পরিমান বিকল্প লেখেন সামগ্রীর প্রয়োজন অনুভূত হল। তখন পার্চমেন্ট, পশুর চামড়া, ভেলাম অর্থাৎ বাছুরের চামড়া, পাথর, ব্রোঞ্জ, কষ্ঠ খন্ড ইত্যাদি লেখেন সামগ্রী হিসাবে ব্যাপক ব্যবহৃত হত। [মধ্যযুগে 'গ্রন্থ' লিখিত হয়েছিল পার্চমেন্ট ও ভেলাম দিয়েই)।

গ্রন্থের কথা ও কাহিনি: গ্রন্থের উপাদান কি কি তাহা অবগত করার জন্য:-(১) কাগজ, (২) মুদ্রণ (৩) চিত্রণ (৪) গ্রন্থন (৫) গ্রন্থের মুদ্রণ। প্রাচীন ব্যাবিলনও আসিরিয়ার লোকেরা ব্যবহার করেছে মাটির ফলক/চাকতি (Clay Tablet)। ২. মিশরের লোকেরা প্যাপিরাস (papyrus) নামক ঘাস এবং ভারতীয়রা ভূর্জপত্র ও তালপাতা।

আধুনিক কাগজ :-প্যাপিরাস পর্যন্ত কাগজের যেরূপ সম্পর্কে আমরা দেখলাম - কাগজ তৈরির কোন সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবিত হয় নি .কিন্তু মানুষ ফিব্রিনস পদার্থ কে মন্ড করে তার থেকে কাগজ প্রস্তুত করতে শিখল। অনেকে মনে করেন বা অনুমান করেন কীটপতঙ্গের কাছ থেকে মানুষ শিখেছে এই কৌশল, বোলতা ভিমরুল, মৌমাছির চাক দেখতে অনেকটা কাগজের মতো এবং তা গাছ পালা জাত পদার্থ থেকেই তৈরী।

চীনের গৌরব : সে যায় হোক, আধুনিক কাগজ সর্ব প্রথম তৈরী করার গৌরবটি চিনকেই দেওয়া হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে চীনারাই প্রথম জৈব পদার্থকে মন্ডে প্রিন্ট করে কাগজ তৈরীর উপায় উদ্ভাবন করেন। 105 খ্রিস্টাব্দে (Tasai Lung) নামে এক ব্যক্তি তদানীন্ত সম্রাটকে সরকারি ভাবে জানিয়ে দেন যে কাগজ তৈরির নতুন উপায় আবিস্কৃত হয়েছে। Tasai Lung নিজেই আবিষ্কার করতে পারেন বলে তাঁকে সম্রাট কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়েছিল এবং চীনের ইতিহাসে তাঁকেই কাগজ তৈরির জনক বলা হয়। চীনের এ আবিষ্কারের কথাটি সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে তুর্কি স্থান থেকে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দীর কাগজ পরীক্ষা করে।

কাগজের ইতিহাস: কাগজ মনুষ্য সভ্যতার একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। অতি ব্যবহারের ফল আজ আর এতো বিস্ময়ের কিছু পাই না। কিন্তু একটু ভাবলেই একথা নিশ্চয় আশ্চর্য ঠেকবে যে কেমন করে তুলা, কাঠ , ঘাস পাতা ইত্যাদি থেকে আমরা কাগজ পাচ্ছি এবং ছিন্নবস্ত্র থেকে কাগজ পাচ্ছি। গ্রন্থের উপাদানগুলির মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় হলো লেখা যাবে কিসে, বা ছাপায় হবে কিসে, তাই গ্রন্থের উৎপত্তিই বা হবে কি করে?

ব্যাখ্যা: কাগজ হল লেখার আধার। আধুনিক জগতে পদার পনের পূর্বে অনেক বিবর্তনের অনেক সোপান অতিক্রম করতে হয়েছে। এই কাগজ নামক বস্তুটির **অর্জন** করার জন্য। আদিরূপ : লেখেন দ্রব্য – সভ্যতার ইতিহাস একটু নাড়াচাড়া করলেই তাহা বোঝা যাবে। ফুরড্রিনের যন্ত্র নামক প্রথম কাগজের কল ফ্রানসে আবিষ্কৃত হয় 1798 খ্রি:।

ভারতে কারখানা চালু হয় বাংলার বালি শহরে 1870 খ্রি : আরো আগে অবশ্য 1711 তে মাদ্রাজে এবং 1825 এ শ্রীরামপুরের মাশরম্যান সাহেবের কাগজের কল। কাগজের কাঁচামাল :- ১. ছিন্নবস্ত্রখন্ড –তুলোর ও রেশমের, ২. পাঠ শন ও এই জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য ৩.বাঁশ ও খড়, ঘাস।

কাগজের প্রকার ভেদ:

- চায়না মার্বেল, নিউস প্রিন্ট, পোষ্টার , রেমি , টিস্যু ,
- গ্রেইনেড
- ইন্ডিয়া
- জাপানি
- লেজার
- ভেলাম
- এয়ানটিক
- আর্ট
- বন্ড
- ব্যাঙ্ক
- blotting

কাগজের কালির, ও ছাপার বিভিন্ন ধরন ও প্রকার জানার পরেই বই ছাপার কথা বিবেচনা করা হয় –

মুদ্রণের ইতিহাস: কাগজের বৃত্তান্ত জানার পর আমাদের উৎসুক্য জাগে কি করে এই কাগজের ওপর ছাপা হয়। যে ভাষাতেই ছাপা হোক ছাপার কাজটা দঁড়িয়ে আছে লিপি ও বর্ণমালার ওপর। মানুষ আগে মনের ভাব আঁচড় কেটে প্রকাশ করতে শিখেছে, তার পর সেই আঁচড়গুলি থেকেই বর্ণমালার সৃষ্টি করেছে তাই ছাপার কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে লিপি ও বর্ণমালার ইতিহাস কিছু জানা প্রয়োজন।

লিপির উৎপত্তি: আমরা যাকে ভাষা বলি তা হোল আমাদের মনের ভাব প্রকাশ একটি উপায়। এর মূলে আছে সঙ্কেত, যখন সংকেত কে অঙ্কিত করি তখন হয় লিপি। তাই এখানে চিত্র লিপির কথা আসে। আমরা প্রথমে চিত্র লিপি দুই প্রকারের ধরণ পাই- যথা :- ১.অক্ষর, ২.প্রকৃত বর্ণমালা। আবার লিপি যদি অক্ষরের প্রতীক হলে অসুবিধা হয়। উদাহরণ– রাজা কথাটি সহজে ভাগ করা যায় রা- জা। কিন্তু রাষ্ট্রকে ভাগ করা যায় কি ? এক্ষেত্রে ধ্বনি লিপির প্রতীক। কারণ বর্ণমালার এক একটা বর্ণ যত দূর সম্ভব একটি মাত্র বিশুদ্ধ ধ্বনি কে প্রকাশ করে। তবে ধ্বনি লিপি একে বারে সরাসরি চিত্র লিপির পরেই অবস্থা নয়। এদের মাঝামাঝি একটা অবস্থা ছিল যেখানে লিপির পর্যায়ে পড়ে কিউনিফর্ম, হায়ারোগ্লিফিক, হ্যারেটিক ও ডিমোটিক লিপি। এর পরে কিউনিফর্ম, হায়ারোগ্লিফিক প্রচলন দেখা যায়।

বর্ণ লিপি বা বর্ণমালার উৎপত্তির**:** আধুনিক গবেষণা মতে বর্ণমালার আদি জন্ম ভূমি হবার গৌরব অর্জন করেছে – সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন। সেমিটিক জাতির অবদান হল বর্ণমালা। অবশ্যই এটা ঠিক যে এই আবিস্কারের মূলেছিল কিউনিফর্মও মিশরীয় লিপির প্রভাব ও অনুপ্রেরণা।

কালির ইতিহাস/কালির ইতিবৃত্ত: কাগজের পরেই মুদ্রণের অপরিহার্য সামগ্রী কালি

কালি এক প্রকার তরল রঙিন পদার্থ যার রং অন্য্ পদার্থের উপরে সংক্রমণ করা যায় প্রায় 2500 খ্রি: পূর্বাব্দে মিশর, চীন, প্রভিতি দেশে ভাষার কালির চলন প্রাচীনতম আমল থেকে ছিল ভারতবর্ষেও।

প্রাথমিকভাবে ভুসা আর গঁদ জাতীয় আঠা মিশিয়ে শক্ত কাঠির মত করে নিয়ে জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে লেখা হত। এই জাতীয় কালির কাঠি নানা রকমের বনজ পদার্থ বা রক্ত মিশিয়ে রঙ্গিন করা হত বা যেত .পরবর্তীকালে যাতে করে কাগজে কালি থেবড়ে না যায়, এবং চট করে শুকিয়ে যাওয়ার জন্য বাজারের লৌহজ লবন (Iron Salt) ব্যবহার করা হয়েছিল।

কালির উৎপত্তি কিভাবে: ছাপাখানার কালি তৈরির প্রণালী স্বতন্ত্র ধরণের রঙটি তিসি রেড়ি জাতীয় তৈলের মাধ্যমে বিকীর্ণ করা হয়, তার পর শিরীষ, রজন বার্ণিশের কাজের জন্য- এই আঠা প্রস্তুত করে পরবর্তীকালে ছাপায়ের কাজের জন্য কালি এমন ভাবে তৈরী হয়, যার মধ্যে এলে ও ক্ষতি না হয়, এবং অল্পত্বেই যেন উঠে না যায় এবং রং স্পষ্ট হয় ওঠে। ছাপার কালি গুড়ের মত চট চটে বা আঠালো না হলে হরফের উপরে বসে না বরং গড়িয়ে যায় . তাই শিরীষ, গ্লিসারিন ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত শক্ত অথচ মোলায়েম বলনে কালি লাগিয়ে বিন্যস্ত হরফের উপরে বুলিয়ে শেষ ছাপ তোলা হয়। এর পরে মানুষের মনের মধ্যে উৎসুক্য জাগে মুদ্রণের দ্বারা আরও কি করে জ্ঞান অর্জনের পক্ষে সুবিধা হবে তা নিম্নে বর্ণিত হল।

বই(গ্রন্থ) কি? কিভাবে বই এর ধারণা আসে ?

বই(গ্রন্থ) এর মূলে আছে ভাষা। লিখিত ভাষা, কথিত ভাষার লিখিত রূপ। এখন প্রশ্ন আসে ভাষা কি? ভাষার বিনিময় আকারে ইঙ্গিতে ও হতে পারে। অনেকে কথা **যা- ও- যে** কোন কথা না বলে। কিন্তু এই পদ্ধতি জনে জনে সীমাবদ্ধ কথা বললে তা পাঁচ জনে শোনে বোঝে। আর সেই কথা গ্রন্থ বদ্ধ হলে দেশ কালের গন্ডী পেরিয়ে যায়। বিশ্বজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। একালের বই বলতে আমরা বুঝি মুদ্রিত গুচ্ছবদ্ধ পত্রসমষ্টি বুঝি। কিন্তু কাগজ হল হালের আবিষ্কার। তার আগেও মানুষ লিখেছে গ্রন্থ গত আকৃতি ও গঠন যার নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন পুরাতত্ত্ববিদেত। সুমেরীয়, আসিরীয়, ব্যাবিলনীয় প্রমুখ সভ্যতার কীলকাকৃতি বা (Cuniform) লিপি খোদিত হাত মাটির চাকতির উপরে ছুঁচালো কোন ধাতু বা হাতির দাঁত বা কীলক জাতীয় কাঠের খন্ড দিয়ে লেখা হয়ে যা বার পরে মাটির চাকতি গুলো পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। সে যুগেরই প্রচুর মাটির চাকতি গ্রন্থ পুরাতাত্ত্বিকদের আবিষ্কার ধরা পড়েছে। তার পরেই পাই আসিরীয় রাজা অসুরবানিপালের নিনেভের গ্রন্থের জোড়া প্রচুর চাকতি গ্রন্থ। এইভাবে কিউনিফর্ম থেকে হায়ারোগ্লিফ লেখামালার প্রচলন হয়েছিল।

হায়ারোগ্লিফ কি ?

এটা মিশরীয় সভ্যতায় দেখা যায় যা-চিত্রকেন্দ্রিক লিপিমালা শব্দটির উৎপত্তি আছে গ্রিকশব্দ (hieros) অর্থাৎ পবিত্র এবং (glyphein) অর্থাৎ খোদাই। কোন চিন্তার প্রতিরূপ হিসাবে এক একটি ছবি আঁকত-এই ছবি একে কয়েকটি শব্দ প্রকাশ পেত। এই রকম সাত'শ বিভিন্ন শব্দের সমারহে গঠিত এই ভাষা। এবারে বলবো বই কি? এবং কিভাবে উৎপত্তি হয় -বই এর ‘পাতা’ এবং ‘পত্রাঙ্ক’ কথাটির উৎপত্তি লিখিবার উপকরণ এই পাতা বা পত্র থেকে। আর লিখিত পত্রপুঞ্জ এক সঙ্গে গাঁথা বা (গ্রন্থিত)হয় বলে এর নাম -‘ গ্রন্থ’।

বই শব্দটি এসেছে আরবি ‘বহী’ থেকে যার অর্থ দৈবঅনুজ্ঞা। আর ‘পুস্তক ‘কথাটির মূলে আছে পারসিক “পুস্ত” (pust) অর্থাৎ চামড়া থেকে উৎপন্ন। এবার সঠিক ভাবে বা সজ্ঞায়িত ভাবে বই কাকে বলা হয়? বই কথাটি এসেছে আরবি শব্দ “বহী” থেকে।

দুই পাশে দুই মলাটের মধ্যে গ্রথিত –মুদ্রিত পাঠ্য সামগ্রী বই নামে পরিচিত। ২)আরো ভাল ভাবে বলা যায় মুদ্রিত, সজ্জিত ও গ্রথিত পত্র পুঞ্জকেই বলে গ্রন্থ, বই বা book, অর্থাৎ দুই মলাটের মধ্যবর্তী পত্রসমষ্টি তবে প্রশ্ন আসবে–পুস্তক এবং পুস্তিকা অর্থাৎ বই এর ইস্তাহার জাতীয় রচনার প্রভেদ বিবেচনীয় খুব মোটা বই যেমন পুস্তক, খুব চটিবই ও তেমনি পুস্তক। প্রভেদ মূলত অন্তর্নিহিত বিষয় বস্তু নিয়ে। এইভাবে বিভিন্ন বাদানুবাদের পরে-

UNESCO একটা হিসাব বেঁধে দিয়েছে 49 পৃষ্ঠার কম হলে সেটি বই বলে গণ্য না হয়ে পুস্তিকা (pamphlet) শ্রীনিভুক্ত হবে। কানাডা , আমেরিকা প্রভৃতি , কিছু কিছু দেশ এই হিসাব মেনে চলে।

ইংরেজদের হিসাব আবার অন্য্ রকম, যার দাম অন্তত 6 পেনি সেটাই বই। ভারবর্ষেতে এমন স্পষ্ট কোন নিয়ম চালুনেই। পুস্তিকা ও অনেক ক্ষেত্রেই বই হিসাবে চলে যায়। বলা যেতে পারে 49 পৃষ্ঠার নিয়ম মানতে গেলে বহু কবিতার বই- ই গ্রন্থাগারের তাকে তালিকা বিন্যাস অনুযায়ী সজ্জিত হবে না বা ঠাঁই পাবেনা।

বই (গ্রন্থ) এর প্রাথমিক ধারণা ও আবিষ্কার: প্রথম বই এর সন্ধান কিভাবে আসে। আধুনিক কালের যুগান্তরকারী আবিষ্কার সচল হরফ (Movable type)। প্রতিটি হরফ স্বতন্ত্র ভাবে খোদাই করে সাজিয়ে সাজিয়ে বা কি গঠন করে ছাপান। এই পদ্ধতির আবিষ্কারক হিসাবে জার্মানির যোহান গুটেনবার্ক (Gutenburg) এবং হল্যান্ডের লরেন্সকস্টার রের নাম যুক্ত আছে।

* গুটেনবার্গ জার্মানির মাইনজ শহরে এটি চালু করেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তাঁর মুদ্রিত 'বিয়াল্লিশ পংক্তির বাইবেল 'বিখ্যাত'।
* ইংল্যান্ডের প্রথম মূদ্রাকার উইলিয়াম ক্যাক্সটন (William Caxton) তাঁর প্রথম মুদ্রিত বই বেরিয়ে ছিল 1477 খ্রিস্টাব্দে।
***** ভরতবর্ষে প্রথম ছাপাখানা খোলেন পর্তুগিজ মিশনারিরা গোয়াতে, সম্ভবত 1556 খ্রি:।
*1557 তে জন দ্য বুস্টামেন্ট ছাপান দট্রিনা ক্রাইস্টা।
*1577 –এ ত্রিচুরে প্রথম তৈরী হয় মালাবার হরফ। বাইবেলের তামিল অনুবাদ ছাপা হয় 1711 খ্রি: এবং এই সময়ে মাদ্রাজের ট্রেকোয়ারার শহরে বসে প্রথম কাগজ তৈরীর কল। তবে এর আগে ভীমজি পারেখের চেষ্টায় 1674 খ্রি: বোম্বাই শহরে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র চালু হয়েছিল।
* বাংলা হরফের প্রথম ব্যবহার হয় 1778 খ্রি: প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেদ রচিত 'এ গ্রামর অফ বেঙ্গলি লেঙ্গুয়েজ '{ [ইংরেজি ভাষায় লিখিত এই বই এর উদাহরণ উদ্ধৃতি গুলি ছিল বাংলা হরফে}]
* এই হরফ তৈরী করেন জন উইলকিন্স - যাঁর সহকারী ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। অবশ্য এসম সময়ে লন্ডনে বসে উইলিয়াম বোল্টস বাংলা হরফের ছাঁচ তৈরী করে ছিলেন।
* এরপর উইলিয়ামের তত্বাবধানের কলকাতার কোম্পানি প্রেস থেকে ছাপা হয়। প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই জোনাথন ডানকানের 'ইম্পেকোড' এর বঙ্গানুবাদ (English Book)
* ইতিমধ্যে পত্রিকা কেন্দ্রিক কিছু ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে এবং ক্রনিকল প্রেসটি মুদ্রিত হয়ে বেরিয়েছে আপনজনকৃত প্রথম ইংরেজি বাংলা বিধান– ইংরেজিও বাঙ্গালী বোকেবিলারি- 1793
* বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত ও বাংলা হরফকে মর্যাদাদেন 'উইলিয়াম কেরী' তাঁর বাংলা বাইবেল ছাপা হয় 1801 খ্রি: শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেসে।
* উইলকিন্সের সহকারী পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর এই দক্ষ করিগরিগরের হাতে বাংলা হরফের ছাঁচ ঢালাই হল এবং হরফ তৈরী হল।
*1832 খ্রি : মধ্যে কেরীসাহেব 'দু ' লক্ষ বারো হাজার বই ছাপিয়ে ফেলেন। কেননা এর মধ্যে 1779 খ্রি: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় বই লিখিত এবং মুদ্রিত হতে থাকে শ্রীরামপুর মিশনে।
*প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণে বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগারের পরিচয় পাওয়া যায়- ব্যাবিলনীয় সেমেটিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সারগনের (Sargon-I) রাজধানী - আক্কাদে (Akkad) অথবা আগাদে (Agade) আনুমানিক খ্রি: পূর্ব সপ্তম শতকে এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল।
* বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগারিকের যে নাম পাওয়া যায় তিনি ব্যাবিলনীয়, তাঁর নাম (আমিলানু) Amilanu

* ভারতের গ্রন্থাগারের ইতিহাস শুরু হয় বৌদ্ধ সভ্যতার শেষ অধ্যায় থেকে গ্রন্থাগারের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় পালি শব্দ 'পিটক' থেকে। হস্তলিখিত বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পিটকে রাখা হত।

* 'সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রথমচিন্তা করেছিলেন জুলিয়াস সিজার ' সকলেই লেখাপড়া শিখুক এই উদ্দেশ্য নিয়ে

*প্রাচীন গ্রন্থাগার মূলত গ্রন্থের সংগ্রহ, প্রচলিত অর্থে আমরা তাই বুঝি। কিন্তু গ্রন্থ বা বই কি ? বই হচ্ছে মানুষের দেখা জানা বা অভিজ্ঞতার লিখিত দলিল।

আধুনিক সভ্য মানব সমাজের পার্থক্য সূচিত করেছে লেখার আবিস্কার। যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষের জ্ঞান ও তার কর্ম কীর্তিকে পৌঁছবার কাজে কথ্য ভাষা অপারগ। তাই আজ থেকে বিশ বা তিরিশ হাজার বছর আগে প্রস্তর যুগের মানুষ গুহায় অংকন করে, পাহাড়ের গাইয়ে খোদাই করে তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা অপর যুগের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

*বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানী গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন" A Collection of books assembled for use , as against collections assembled for sale, for display , for the pride of possession or for any of the purposes for which books may be assembled.

আরও সহজ ভাবে বলা যায় যে গ্রন্থাগার ব্যবহারকরীর জন্য আপ টু ডেট তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ ও চাহিদা মাতৃবিতরণ করে তাকে আধুনিক গ্রন্থাগার বলে।

সামগ্রিক ভাবে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনার কথা ও কাহিনি:

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের উৎপত্তি : গাছের ছালকে পরিষ্কার করে নিয়ে তাঁর উপর লিখেছে প্রায় সকল দেশেরই লিখেয়েরা। কলদিয়রা (Chaldes) গাছের ছালকে বলত (Liber) এই থেকে ল্যাতিন লিবর (Libre) –যার মানে বই লাইব্রেরি শব্দটির উদ্ভব এই থেকে। চীনা সভ্যতা ও অতি প্রাচীন। অন্তত হাজার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুষ্ঠ লিখন পদ্ধতির নিদর্শন মেলে চীনে। লিখবার সামগ্রিক হিসাবে দেখা যায় হাড়, কচ্ছপের খোল বাঁশ, কাঠ, রেশম, ও সুতিবস্ত্রের ব্যবহার। সামগ্রী ভেদে লেখা হত চোখা অস্ত্র, পালকের কলম, এবং তুলি দিয়ে। ভারতবর্ষে লেখেন সামগ্রীর প্রাচীন নিদর্শন মেলে গাছের ছাল, ভুজপত্র, তালপাতা, এবং বাঁশ ও কাঠ ইত্যাদি। মধ্যেযুগে বই রাখা হত মঠে বা গীর্জায়। ভারত তিব্বত প্রভৃতি দেশে ও মন্দিরে পুঁথি রাখার নজির মেলে। ভারতে দেখা যায় পন্ডিত আর পুরোহিতদের দখলে পুঁথি থাকত। পন্ডিতেরা টোলে চতুস্পাঠীতে ছাত্র ও শিষ্যদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পুঁথি রাখত। বাসুদেব সার্বভৌমের কাহিনি দ্বারা জানা যায় যে মিথিলার নৈয়ানিক পন্ডিত পক্ষধর মিশ্রর টোলে অধ্যয়ন করে নিয়ে আসেন নবদ্বীপে ন্যায় চর্চার পত্তন করেন। সে যুগে প্রায় সবদেশেই শিকল দিয়ে গ্রন্থ আটকে রাখার রেওয়াজ ছিল, যাতে করে চুরি না হয়। ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধযুগের গ্রন্থ গৌরব কম ছিলনা তক্ষশিলার গ্রন্থাগার ষষ্ঠ খ্রি: সুসমৃদ্ধ ছিল। বিজাপুরের 'বিদ্যাপুরি এবং নগর কোটের জ্বালামুখী মন্দিরের পুঁথি সংগ্রহ ছিল বিশিষ্ঠ ও গৌরবের সামগ্রী। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম তো বিশ্ববিখ্যাত। এখানে বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা চর্চার জন্য দেশ বিদেশ থেকে বিদ্যার্থী আসতেন। এখানকার গ্রন্থগৃহ যাকে বলা হত **জ্ঞান ভান্ডার** - তার নাম ছিল **-'রতনগঞ্জ'** তিনটি স্বতন্ত্র বাড়ি নিয়ে ছিল এই জ্ঞান ভান্ডার রত্নসাগর , রত্নদধি , রত্নরঞ্জক ,

গ্রন্থের উৎপত্তি : ল্যাটিন ভাষায় এই গ্রন্থের নাম ছিল কোডেক্স (Codex), যার নাম থেকে এসেছে কোড (Code) কথাটি গ্রিস ও রোমের প্রবর্তিত লেখার কায়দা ও বর্ণমালা পদ্ধতি সভ্য জগতে বিশেষ দান। গাছের ছালকে পরিষ্কার করে নিয়ে তাঁর উপর লিখেছে প্রায় সকল দেশেরই লিখিয়েরা। ক্লদিয়ারা (Chaldes) গাছের ছালকে বলত (Liber), এই থেকে লাতিন লিবর (Libre) যার মানে "বই" বা "গ্রন্থ" বর্তমানে গ্রন্থাগার বলতে কি বোঝায়?

গ্রন্থাগার হল পাঠোপযোগী মুদ্রিত ও মুদ্রিত সকল সংগ্রহ এবং দৃশ্য ও শ্রাব্য সকল সংগ্রহের সমষ্টি। গ্রন্থগার কথাটি ইংরেজি "Library 'শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ, ইংরেজি "Library' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন 'Librarium' শব্দ থেকে " Librarium " কথাটির মানে "a book case " (গ্রন্থধার) যাহা বর্তমান ও অতীত গ্রন্থাগার এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

উদ্দেশ্য: আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি নির্ণয় করা হয়েছে।

1) গ্রন্থ (বই) কি কিভাবে উৎপত্তি হয় তার ধারণা পাওয়া যায়।

২) কাগজ, কালি, মুদ্রণ, সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য।

3) লেখেন সামগ্রিক হিসাবে অতীত বর্তমানের ধারণা পাওয়ার জন্য।

4) প্রাথমিকভাবে লেখার আধার হিসাবে কি কি, লেখেন সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করা হত তার ধারণা পাওয়ার জন্য।

5) কাগজ প্রস্তুতিতে অতীত বর্তমান কাঁচামালের কি কি উপাদান প্রয়োজন তাহা জানার জন্য।

6) বাংলা অক্ষের ধারণা কিভাবে আসে তাহা জানার জন্য।

7) গ্রন্থাগারের ধারণা কিভাবে আসে তা-জানার জন্য।

8) লেখনী সামগ্রী হিসাবে 'পত্র' ও 'পত্রাঙ্ক' এর ধারণার পার্থক্য জানতে।

9) বই কাকে বলে? তার ধারণা জানতে বা জানার জন্য।

10) গ্রন্থাগার কাকে বলে? তার ধারণা জানার জন্য।

11) অতীতে পঠন পাঠনের ও জ্ঞান অর্জনের জন্য গুরু গৃহে শিকলের বাঁধা থাকতো গ্রন্থসম্ভার। তার থেকেই গ্রন্থাগারের ব্যবহারের নিয়মাবলীর ধারণা আসে।

12) অতীত ও বর্তমান গ্রন্থাগারের ধারণার প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

13) লাইব্রেরি এর বিভিন্ন রূপে তথ্য সংগ্রহের উপায় বর্তমানের গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার ভিত্তিতে গ্রন্থাগারের রূপরেখা-ডিজিটাল লাইব্রেরি .ভার্চুয়াল লাইব্রেরি, ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি ইত্যাদি।

গবেষণা পদ্ধতি: এখানে কোনরূপ স্যাম্পল (Sample) এর সাহায্য নেওয়া হয়নি তবে গবেষণার পদ্ধতি অনুযায়ী অতীতের Record ও তথ্যবিশ্লেষণের জন্য ঐতিহাসিক গবেষণার (Historical Research) অনুসরণ করা হয়েছে বলাই যেতে পারে। আলোচ্য গবেষণাকৃত প্রবন্ধটিতে বিবৃত করা হয়েছে প্রাথমিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে 'গ্রন্থ' (বই) ও "গ্রন্থাগারের" ভাবনার রূপান্তর কিভাবে হলো এবং বই এর পরিপূর্ণ আকার কিভাবে প্রকাশিত হল, যার-মুলে কাগজ, কালি, মুদ্রণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর কালের প্রবহমান ধারায় ও ক্রমবিকাশের বিচিত্রও সমৃদ্ধ গতিপথে যুগে যুগে কত পরিবর্তন হয়েছে - লেখেন সামগ্রী, লেখেন পদ্ধতি, বর্ণলিপি, ভাষা প্রভিতি কতবিচিত্র পথে অগ্রগতি লাভ করেছে। জ্ঞানের মনন বোধ ও অনুভবের এই লক্ষ্য গুলি মানব সংকৃতির উজ্জ্বল উপাদান, এই উপাদান গুলি যথাযোগ্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয়েছে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের। হাজার হাজার বছর ধরে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে গ্রন্থগার।

তথ্য বিশ্লেষণ : 1) অতীতে গ্রন্থের ধারণা ও বর্তমানের গ্রন্থের ধারণা এবং কিরূপে রূপান্তর হল-তার ব্যাখ্যা।

২) অতীতে গ্রন্থাগারের ধারণা ও বর্তমানের গ্রন্থাগারের ধারণার কিরূপে রূপান্তর হল-তার ব্যাখ্যা।

ফলাফল: প্রাথমিকভাবে গ্রন্থবিদ্যা থেকে গ্রন্থের ধারণা এসেছে। কারণ গ্রন্থবিদ্যা কথাটির ইংরাজী Bibliography এই থেকে গ্রন্থের ধারণার একাধিক অর্থবোধক। যার অর্থছিল 'গ্রন্থ' লেখা কিছু কাল পরে অর্থ বদলে দাঁড়াল গ্রন্থ নকল করা অর্থাৎ লিপিকরের কাজ। ক্রমে ক্রমে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখা বা বিবরণ। লিপি কৌশল আয়ত্ব করার পর মানুষ চেয়েছে নিখুঁত রূপে একটি লিখিত বস্তুকে বহুসংখ্যক করার কৌশল আবিষ্কার করতে। ইচ্ছার বসেই মানুষ আবিষ্কার করেছে মুদ্রণ বা ছাপার কৌশল। যার ফলশ্রুতি হল মুদ্রণ যন্ত্র যার ফলে নিখুঁত ভাবে বহুসংখ্যক মুদ্রণে সক্ষম। এরপরে ক্রমান্বয়ে শুরু হয় কাগজ খন্ডকে একত্রিত করে বইয়ের আকারে বাঁধা। যেহেতু খোদাই যুক্ত কাষ্ঠ খন্ডকে বলা হয় ব্লক (Block) তাই কাঠ খোদাই এর সাহায্যে ছাপা বইয়ের নাম করণ হয়েছে ব্লক বই। কাগজের মতো ছাপার বেলাতে ও চীনের সম্মান অগ্রগণ্য। ব্লক বইয়ের প্রথম নিদর্শন চীন থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম ব্লক বই হল - Bblia pauperum (Poor Man's Bible) অর্থাৎ দরিদ্রের বাইবেল। দ্বিতীয় শ্রেণির ব্লক বই যার এক পৃষ্ঠায় আছে ছবি ও অপর পৃষ্ঠায় আছে ছবির ব্যাখ্যা, তার বিখ্যাত উদাহরণ হল Ars

Momorndi যার অর্থ হল একখানি এই শ্রেণির ব্লকবই। এই ভাবে চতুর্থ পর্যায়ের ব্লকবইয়ের পরে গুটেনবার্গের ছাপাখানায় যেসব ছোট বড় বই ছাপা হয় তার মধ্যে বিয়াল্লিশ পংক্তির বাইবেল বলা হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থের সুচারু কাজের মাধ্যমে গ্রন্থের আধুনিক রূপ পুরোপুরি প্রকাশ পেতে শুরু হয়েছে , আধুনিক কাগজ ও মুদ্রণ প্রচলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপও ইতালির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতঃপর ছাপায়ের গ্রন্থগুলি নির্দিষ্ট স্থানে রাখার প্রয়োজন হল গ্রন্থাগার। সেকালের শ্রুতি ও স্মৃতির সম্বল করে এক জনের চিন্তার ও জ্ঞান ভান্ডার অপর জনে ধরে রাখতে, আবার তা ঐ ভাবে চলত পরম্পরা ক্রমে। তার পরে এসেছে পুঁথি লেখার যুগ, ছাপার হরফে এবং লিখিত ভাবে এ কাজ হওয়াটাই চিরা চরিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোলকে হযদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ ক্রিয়া থাকিত, তবে নীরবে মহাশব্দের সঙ্গে এই লাইব্রেরি এর তুলনা হইত"। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে প্রবাহ স্থির হইয়া আছে মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। কাল স্রোত সব কিছু হারিয়ে গেলেও গ্রন্থাগার কিন্তু মানুষের জীবনে শ্বাশ্বত আলোক উৎস। মানুষের অগ্রগতিতে গ্রন্থগার এক আলোক দিশারী। মানুষের উপলব্দির একমাত্র ধারক ও প্রসার কেন্দ্র "গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার"। গ্রন্থের মধ্যে মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করে রাখে এবং বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে রবীন্দ্র চিন্তায় গ্রন্থের এই স্থিতিশীল অথচ চলমান রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমও বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে, যার ফল সরূপ গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ধারণার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে (gramophone , Tape Record , Microfilim) ইত্যাদি . প্রাথমিকভাবে গ্রন্থাগারের ধরন অনুযায়ী তিন প্রকার হলেও বর্তমানে Digital , virtual , Electronic ইত্যাদির গ্রন্থাগারের রূপান্তরের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে এবং বর্তমানে অনেক জায়গায় প্রচলিত। আর্থিক সচ্ছলতা সমাজের এক মৌলিক চাহিদা। তাই সমাজের প্রয়োজন জরুরি গবেষণাও উপযুক্ত তথ্য ভান্ডার। মানুষ শুধুমাত্র রুটির সাহায্যে বাঁচতে পারেনা। তাই কোন ব্যক্তি - মানুষের কাছ থেকে সমাজের এই বিপুল প্রত্যাশার কথা যখন আমরা চিন্তা করি তখনই প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজের গ্রন্থগারের পূর্ণ সম্ভাবনার দিকটি উপলব্ধি করতে পারে। ভারতের গ্রন্থাগারের ইতিহাস শুরু হয় বৌদ্ধ সভ্যতার শেষ অধ্যায় থেকে গ্রন্থাগারের উৎস খুঁজে পাওয়া যায় পালি শব্দ 'পিটক' থেকে। হস্তলিখিত বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পিটকে রাখা হত।

উপসংহার: ক্রমে ক্রমে ছাপাখানার দৌলতে বই এর বাজার সরগরম হতে লাগল। প্রাচীন বা মধ্যযুগে বইয়ের কোন বাজার ছিলনা ইউরোপীয় দেশেও তাই। চাইলে নকল করে দেওয়া হত। বই পাওয়া যেত স্টেশনারি (Stacioneri) দোকানে। এসব দোকানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকত, যেখানে নকল নবীশের দল থাকত। 1378 খ্রিস্টাব্দে দায়িত্বিবান বিদ্যায়তন কর্মী সম্পর্কে লিব্রেয়ার (Lbraire) কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। যার অর্থ গ্রন্থাধিপ (Bookman) 1230 খ্রি: জার্মানির স্ট্রাসবুর্গে পুস্তক ব্যবসায়ী হিসাবে 'স্তাসিও নিয়েরার (Stcionerer) কথাটি পাওয়া যায়। আবার 1365 খ্রি: ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত পুস্তক বিক্রিকেন্দ্রের পরিচিতি 'লিব্রেরী (Librarii) 1403 খ্রি: লন্ডনস্থ Sationary বই এর সংস্থা গড়ল। ভারতবর্ষে গুরুগৃহে অধ্যয়ন কাল যাপন করার প্রথা ছিল গুরুর সংগৃহিত পুঁথি পড়ে ছাত্র বা শিষ্যরা বিদ্যালাভ করত। তেমন তেমন ক্ষেত্রে কিছু পুঁথি নকল ও করে নেওয়া যেত সর্বসাধারণের জন্য লিখিত সম্পদ বিশেষ ছিলনা। রাজা- মহারাজার থাকত সভাপন্ডিত বা সভাকবি। তাঁরা শাস্ত্র বা কাব্য পাঠ করে শোনাতেন সবাই ছিল শ্রুতি নির্ভর। কিন্তু মুদ্রণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সকলের ঘরে ঘরে এসে গেল বই, কেবলমাত্র গুরুগৃহে সীমাবদ্ধ রইল না। নকল নবীশের প্রয়োজন ঘুচল। সর্বসাধারণের শিক্ষালাভের অধিকারী হয়ে উঠল সাহিত্য রাজসভা থেকে নেমে এসে স্থান নিল জন সভায়। বই এর বিচারক কেবলমাত্র রাজা বা পন্ডিত রইল না। এলেন প্রকাশক, বিক্রেতা ,পাঠক, সমালোচক , সাহিত্যাদি রচনার মূল লক্ষ্য

সাধারণের জীবন, রুচি প্রকৃতি। সেই সর্বজনীক বই এর ইতিহাস আকার প্রকার ও ব্যবহার নিয়েই গ্রন্থাগারবিদ্যার সূত্রপাত হয়। যাহা গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ভাবনার এক বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সমাপ্ত করণে: বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী) বিভিন্ন বইয়ের ক্রম অনুযায়ী সাজালে নিম্নলিখিত ভাবে হবে :

* পাঠ্য বই (Text Book)
*প্রবন্ধ (Treatise)
*আদর্শ বই (Representative Book)
*প্রকরণ গ্রন্থ (Monograph Book)
*মানক বই (Standard Book)
উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ (Classic book)
আকার গ্রন্থ (Reference Book)

একই রকম ভাবে বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন রকম চাহিদা পূরণের জন্য আজকাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে তার পিছনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা উল্লেখ যোগ্য। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার দেখা যায়, তবে এগুলি সাধারণত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। * জন সাধারণের গ্রন্থাগার, *শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, *বিশেষ গ্রন্থাগার, জ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারে সঙ্গে সঙ্গে মানব মনীষী ও অনুভবের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। এই ভাবে জ্ঞানের প্রচার ও চর্চার জন্য অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান আহরণ ও গবেষণা এখন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভৌগোলিক সীমারেখা ও ভাষার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে জ্ঞান চর্চা এখন বিশ্বজনীন। বর্তমান যুগে পাঠক তাঁর সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে যে বিশেষ গ্রন্থটি ব্যবহার করতে চান, যেটি তাঁর গ্রন্থাগারে না থাকতে পারে, কিন্তু সেই গ্রন্থটি পাঠের সুযোগ গ্রন্থাগারিক হয়তো করে দিতে পারেন বা করা উচিত। বর্তমানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও পরিবর্তিত হয়েছে এবং গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় নতুন নতুন প্রয়োজনের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের আলোকে গ্রন্থাগারের ভূমিকা হয়েছে ব্যাপক সুদূর প্রসারী, কার্যকরী ও তাৎপর্যপূর্ণ , গ্রন্থাগার হচ্ছে অতীতের সঙ্গে বর্তমান, মানুষের সঙ্গে মানুষের, মেধার সঙ্গে স্মৃতির , বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের , সমাজের সঙ্গে সমাজের শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম। আগামী দিনের গ্রন্থাগার তথ্য প্রযুক্তির দৌলতে বর্তমান প্রচলিত (traditional) গ্রন্থাগারের ধারণা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। আগামীদিনের গ্রন্থাগারে বই পত্র পত্রিকা ছাড়া ও CD ROM , E -Book , E - Journals , মাইক্রোফর্ম, প্রভৃতি জিনিস পত্র গ্রন্থাগারে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে আবার বলা যেতে পারে কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ ভাবে চালু হয়েই গেছে। অতঃপর বলা যায় যে -আগামী দিনের গ্রন্থাগারকে নিম্নোক্তভাবেও করা যেতে পারে।

*স্বয়ংক্রিয় গ্রন্থাগার (Electronic Library)
*ডিজিটাল গ্রন্থাগার (Digital Library)
*অপ্রকৃত গ্রন্থগার (Virtual Library)

ইত্যাদির গ্রন্থাগারের প্রকারভেদ অনুযায়ী মনুষ্য সমাজকে আরোও আপ টু ডেট তথ্য প্রাপ্তিতেও সাহায্য করবে ও গবেষণা মূলক কাজকর্ম আরো উন্নত শিখরে পৌঁছবে এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ব্যবহারের প্রচারের প্রসার আরও বিস্তৃতি হোক যাহা মনুষ্য সমাজের, দেশের,ও জাতির জ্ঞান অর্জনের সার্থক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনার আরো উন্নত হোক। তাই কবি গুরুর ভাষায় '*আজ* আলোকের *এই*

ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও। আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও..........' নব নব গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ভাবনার আরোও নুতুন আলোকে প্রস্ফুটিত হয়ে চলুক বা হয়ে উঠুক।

গ্রন্থপঞ্জী:

[1].Chakraborty, Bhubneswar. (1993). Library and information Society, Calcutta: *World Press.*

[2].Chakraborty, Bhubneswar and Mhapatra, Pijush Kanti.(1989) . Library and Information Science: an Introduction, Calcutta: World *Press.*

[3]. Encyclopeadia of Library and Information Science. (1970). New York: *Marrcel, Dekkar***.**

[4] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভী (2011) গবেষণা: প্রকরণপদ্ধতি, কলকাতা: *দেজ*।

[5] শেখ মকবুল ইসলাম (2012) গবেষণা পদ্ধতিবিজ্ঞান: সাহিত্য - সমাজ -সংস্কৃতি, কলকাতা:*বঙ্গীয় সাহিত্য পুস্তক*।

[6] মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার, (1963) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান, কলকাতা: *ওয়ার্ল্ডপ্রেস*।

[7] মহাপাত্র, পীযুষকান্তি (1994) গ্রন্থাগার সংগঠন. কলকাতা : *ওয়ার্ল্ডপ্রেস*।

[8] দাস, আসিতাভ (2016), গ্রন্থনীড় .কলকাতা: *বুকস হেভেন পাবলিকেশন*।

[9] চক্রবর্তী, ভুবনেশ্বর, (2010), গ্রন্থাগার ও সমাজ, কলকাতা: *ওয়ার্ল্ড প্রেস*।

[10].বন্দোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চন্দ্র, (1968), গ্রন্থাগারবিদ্যা, কলকাতা: *জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স*।

[11] ওহদেদার, আদিত্য, (1958) গ্রন্থবিদ্যা, কলকাতা: *বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ*।

[12] হালদার, গৌরদাস, (1968) শিক্ষন প্রসঙ্গে সমাজ বিদ্যা, কলকাতা:*বেনার্জী পাবলিশার্স*।

[13] সিরাজুল ইসলাম শম্পা, (2003), বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ (খন্ড -6), ঢাকা:*বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*।

[14].বাংলাপিডিয়া*: ন্যাশনাল এনস◌্াইক্লোপিডিয়া অফ বাংলাদেশ //www.banglapedia.org.*

[15] চ্যাটার্জী, মাধব চন্দ্র ও শাখরু, নির্মলেন্দু, (2003) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অভিধান, কলকাতা*:প্রভা প্রকাশনী*।

[16] *Craughwell, Thomas J., and Damon Smith*. (2004). *Q.P.B. Short History of the Paperback, and Other Milestones in Publishing*. New and updated ed. New York: Quality Paperback Book Club.

[17] *Darnton, Robert*, (2009). *The case for books: Past, present, and future*. PublicAffairs

[18] *Finkelstein, David (2005). An introduction to book history, New York: Routledge.*

[19]*Hall, David (1996). Cultures of Print: Essays in the History of the Book. Amherst: University of Massachusetts Press*.

[20]. *Johns, Adrian (1998). The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making. Chicago: The University of Chicago Press.*

[21]. Nunberg, Geoffrey (Ed.) (1996). *The Future of the Book*. University of California Press.

[22]. Thompson, Susan: "Paper Manufacturing and Early Books", *Annals of the New York Academy of Sciences*, Vol. 314 (1978), pp. 167–176 (169)